জিনোমিকস এবং ক্লোনিং

ফরিদ আহমেদ

(প্রথম পর্বঃ জীবনের গ্রন্থ)

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ক্লোনিং বর্তমানে প্রতিনিয়তই সারাবিশ্বের সংবাদ মাধ্যমসমূহের প্রধান শিরোনামে পরিনত হচ্ছে। অনেকের কাছেই এগুলো নতুন বিজ্ঞান মনে হলেও আসলে এ দু'টোরই রয়েছে সুদীর্ঘ লম্বা ইতিহাস । হাজার বছর ধরে মানুষ কিছু না জেনেই অবলা পশুপাখির ক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে আসছে। যখনই কোন প্রাচীন মানব গোষ্ঠীতে পোষা প্রাণীদের মধ্যে কোন আকাংক্ষিত গুণাবলী বিশিষ্ট প্রাণী দেখা দিয়েছে তখনিই সেই মানব গোষ্ঠী সেই প্রাণীর সাথে একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাণীর প্রজনন ঘটিয়েছে। এর ফলে ধীরে ধীরে, কখনো কখনো শত শত বছর ধরে লোকেরা যে প্রজাতিগুলি পছন্দ করে না সেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ভূপৃষ্ঠ থেকে এবং যে বিশেষত্ব মানুষ পছন্দ করেছে তা অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রকৃতিতে। এই ধরনের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কে বলা হয় 'সিলেকটিভ ব্রিডিং' (Selective Breeding)। সিলেকটিক ব্রিডিং এর মাধ্যমেই এক সময়কার দীর্ঘ পা বিশিষ্ট চঞ্চল ও বুদ্ধিমান পাহাড়ী ভেড়াগুলো বর্তমানে খর্ব পা বিশিষ্ট নির্বোধ ভেড়ায় পরিনত হয়ে র‍্যাঞ্চারদের অতি আদুরে অর্থনৈতিক উপাদানে পরিনত হয়েছে।

প্রাচীন মানুষেরা একই ধরনের 'সিলেক্টিভ ব্রিডিং' পদ্ধতি শস্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। আকাংক্ষিত গুনাবলীর শস্যদের পরম যত্ন এবং আদরের সাথে টিকিয়ে রাখা হয়েছে, এগুলোর বীজকে পরবর্তী বছরে রোপন করা হয়েছে। অন্যদিকে অনাকাংক্ষিত এবং অবাঞ্চিত উদ্ভিদগুলোকে অতি নির্মমভাবে উৎপাটিত করে ধ্বংস করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রাচীন সমাজের এই ধরনের 'সিলেকটিভ ব্রিডিং' এর কল্যানেই আজকে আমরা যে সমস্ত খাবার খাই যেমন ধান, গম, লাউ, কুমড়া, আলু, পটল, টমাটো ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এই অগ্রপথিকেরা কিভাবে এই প্রক্রিয়া কাজ করে তার বিন্দু বিসর্গও জানতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইটুকু বুঝতে তাদের কোন অসুবিধাই হয়নি যে এই জিনিসটি খুবই কাজের। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে অস্ট্রিয়ান ধর্মযাজক গ্রেগর মেন্ডেল (Gregor Mendel) সর্বপ্রথম জেনেটিকসের অন্তর্নিহিত কারণকে ব্যাখ্যা করেন। মেন্ডেল মটরশুটি নিয়ে গবেষনা করেন এবং 'এটমস অফ ইনহেরিট্যান্স'কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যা মুলত একটি মটরশুটি গাছ কি রকম হবে সেটিকে নির্ধারণ করে। বর্তমানকালে আমরা মেন্ডেলের 'এটমস অফ ইনহেরিট্যান্স'কেই (Atoms of inheritance) জিন (Gene) হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি।

চিত্র ১: গ্রেগর মেন্ডেল

আমরা জানি প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীই সেল (Cell) বা কোষ দিয়ে গঠিত। কিছু কিছু প্রাণী আছে যা মাত্র একটি কোষ দিয়ে গঠিত, অন্য দিকে কিছু প্রাণী হচ্ছে লক্ষ কোটি কোষের সমাহার। যদিও সব কোষই অনুরূপ না, কিন্তু একই ধরনের নীতিমালা এবং উপাদান কোষ গঠনে ভূমিকা রেখে থাকে। একই ধরনের প্যাটার্ন, এমনকি একই ধরনের উপাদান সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সমস্ত উপাদানের সামান্যতম হেরফেরেই আমাদের এই গ্রহে গড়ে উঠেছে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বৈচিত্র্যময় বর্ণীল সমাহার।

মানব শরীরের প্রায় প্রতিটি কোষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক একটি ম্যাপ। প্রতিটি অশ্রুবিন্দু, ঝরে যাওয়া ত্বকের প্রতিটি কোষ, এমনকি সামান্য স্পর্শের মধ্যেও রয়ে গেছে একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র। একজন মানুষের হাড়ের গড়ন কেমন হবে, চোখের রং কিরকম হবে, কেমন হবে তার হাত পায়ের গড়ন তার সবকিছুই নির্ধারণ করে দেয় শরীরের দশ ট্রিলিওন কোষ। প্রতিটি কোষ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এক একজন মানুষের সম্পুর্ন ব্লুপ্রিন্ট।

মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতি মুহুর্তেই শরীরের অভ্যন্তরে সংঘঠিত হচ্ছে হাজার হাজার ‘অদৃশ্য কর্মকান্ড’। বাতাস থেকে অক্সিজেনকে আলাদা করা হচ্ছে, তারপর সেই অক্সিজেনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, কোষদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। লিভার রক্তকে পরিশোধন করছে, পাকস্থলি খাবারে এসিড ঢালছে, খাদ্যকে ভাঙ্গার জন্য। নার্ভ সেলগুলো হাইওয়ের মতো বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলেছে। প্রতিটি

অভ্যন্তরীন অঙ্গই প্রতি মুহুর্তেই নিরলসভাবে করে চলেছে তার নিজস্ব কাজ। আমরা সচেতনভাবে এই সমস্ত কাজ করার জন্য কোন নির্দেশনা দেই না শরীরকে। শরীর তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই এই কাজগুলি করে থাকে।

জীবনের যে ব্লুপ্রিন্ট এই সমস্ত অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে নির্দেশ দিয়ে থাকে তা মানুষের জিনোমের (Genome) মধ্যে পাওয়া গেছে। জিনোমই কোষকে নির্দেশনা দিয়ে থাকে জীবনের ভৌত ও রাসায়নিক কর্ম সম্পাদন করতে।

মানব জিনোমের মধ্যেই রয়ে গেছে সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের সাধারণ বৈশিষ্টাবলীর ম্যাপ। প্রতিটা মানুষের একটি মাথা, দুটো হাত, দুটি পা এই সাধারণ বৈশিষ্টগুলি বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও কিছু মানুষের রয়েছে কালো চুল, কারো বা সোনালী। কারো বা আঙ্গুল লম্বা কারো বা খাঁটো। এই পার্থক্যগুলো জিন নামক কাঠামোর অতি সূক্ষ্ম পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে। জিনের পার্থক্যই প্রতিটি মানুষকে অনন্য করে গড়ে তুলেছে এই পৃথিবীতে। প্রতিটি একক কোষই শুধুমাত্র কার্য সম্পাদনকারী জিনকে বহন করছে না, বরং সম্পুর্ন জিনোমকেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে জিনোম মুলতঃ মানুষের সাধারণ বৈশিষ্টাবলীর জন্য দায়ী, অন্যদিকে জিনের সামান্য হেরফেরে প্রতিটি মানুষ অনন্য হয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। আমাদের প্রত্যেকেরই ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে, কিন্তু কারো সাথে কারো ফিঙ্গার প্রিন্টই মিলবে না।

জিনোম শুধু মানুষের মধ্যেই বিরাজমান তা কিন্তু নয়, প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীরই জিনোম রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রজাতির মাছ, পাখি, গাছ এমন কি প্রতিটি ব্যক্টেরিয়ারও নিজস্ব জিনোম রয়েছে। মানুষ এবং ইদুরের মধ্যে আপাতত তেমন কোনই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হবে না, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে নিরানব্বই শতাংশ ইদুরের জিনোমেই মানব জিনোমের মতোই একই ধরনের জিন বিদ্যমান। ইদুর এবং মানুষের ভৌত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াও প্রায় মোটামুটি একই রকমের।

সকল জীবন্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদেই জিনোমের উপস্থিতি এবং তাদের কাঠামোর সাদৃশ্যই ইঙ্গিত করে যে পৃথিবীর সকল প্রাণীই সম্পর্কযুক্ত এবং হয়তোবা একই উৎস থেকে উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যে জিনগুলো ইদুর, মাছ বা ব্যক্টেরিয়ার বা অন্য কোন জীবন্ত প্রাণীর উদ্ভব ঘটায় সেগুলো একই ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে গঠিত। এই রাসায়নিক পদার্থটি একটি অনু যা "Deoxyribonucleic acid" বা DNA নামে পরিচিত।

একশ’ বছর আগেও খুব কম লোকই এই ধারণা গ্রহন করত যে, শুধুমাত্র একটি অনু জীবন্ত একটি প্রাণীর সমস্ত কার্যক্রম নির্দেশিকা বহন করতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, সত্যিকার অর্থেই ডিএনএ অনু তাই করে থাকে। কোষের নিউক্লিয়াসের গভীর অভ্যন্তরে অতি ক্ষুদ্র কাঠামো পাওয়া গেছে যাকে বলে ক্রমোসম (Chromosome)। বিজ্ঞানিরা আগে থেকেই জানতেন যে ক্রমোসম কোষের কার্যক্রমের সাথে জড়িত। কিন্তু ডিএনএ কিভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে তাদের বেশ দীর্ঘ সময় লেগে গেছে।

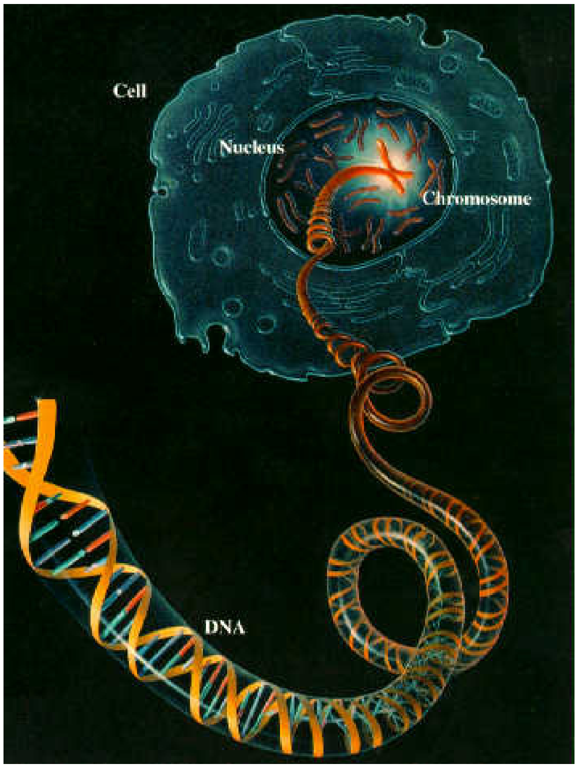

চিত্র ২: ক্রোমোসমের অভ্যন্তরে ডিএনএ-র অবস্থান

ক্রমোসম হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র, সূতাকৃতির কাঠামো যা অবস্থান করে কোষের কেন্দ্রবিন্দু নিউক্লিয়াসে। ক্রমোসম মুলতঃ ডিএনএ দিয়ে গঠিত হয়। ডি এন এর কাঠামো উন্মুক্ত করলে দেখা যায় যে এটা মুলতঃ গড়ে উঠেছে জিনের সমন্বয়ে। অন্যদিকে জিন হচ্ছে সারিবদ্ধ একগুচ্ছ অনু যাদেরকে বলা হয় নিউক্লিওটাইডস (Nucleotides)। ডিএনএ, জিন এবং নিউক্লিওটাইডস এগুলো সবই জিনোমের অন্তর্গত। এই মূল অংশ এবং এর সাথে আরো কিছু কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়েই গড়ে উঠে পুর্নাঙ্গ জিনোম।

সমগ্র জিনোম এবং এর অংশ সমুহকে বোঝার একটি সহজ উপায় হচ্ছে একে একটি গ্রন্থ হিসাবে কল্পনা করা। একটি গ্রন্থের মলাট থাকে, সেই সাথে থাকে অসংখ্য পৃষ্ঠা। সম্পুর্ন

বইটি বেশ কিছু পরিচ্ছদে বিভক্ত থাকে। পরিচ্ছদ গুলো গড়ে উঠে কিছু অনুচ্ছেদ দিয়ে আবার অনুচ্ছেদগুলো গড়ে উঠে কিছু শব্দ দিয়ে। আবার এই শব্দগুলোও কিছু বর্ণের সমাহার। লোহিত রক্তকনিকা (Red Blood cell) এবং প্রজনন সম্পর্কযুক্ত কোষগুলো ছাড়া মানুষের শরীরের প্রতিটি কোষই সম্পুর্ন গ্রন্থটিকে বহন করে। এই 'গ্রন্থ' বা বই-ই হচ্ছে মানব জিনোম।

লোহিত রক্তকনিকার কোন নিউক্লিয়াস নেই, এর মানে হচ্ছে তাদের কোন ডিএনএ নেই। যেখানে শরীরের প্রায় সব কোষেরই ডি এন এর পূর্ণাঙ্গ সেট আছে সেখানে লোহিত রক্তকনিকার প্রতি এই অবিচার কেন তা মনে আসাটাই স্বাভাবিক। লোহিত রক্তকনিকা শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করে থাকে। সারা শরীরে চক্রাকারে ঘুরে কোষে কোষে অক্সিজেন সাপ্লাই দেওয়া আর সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সংগ্রহ করে নিয়ে আসাটাই এদের মূল কাজ। এটা করতে যেয়ে শরীরের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অলিতে গলিতে ঢুকতে হয় এদেরকে। কিছু কিছু জায়গা আছে এতো সংকীর্ন যে লোহিত রক্তকনিকাদের দক্ষ এ্যাক্রোব্যাটদের মতো শরীরকে আকিয়ে বাকিয়ে সংকুচিত করে ঢুকে যেতে হয় অক্সিজেন দেয়ার জন্য আর কার্বন ডাই অক্সাইড সংগ্রহ করার জন্য। নিউক্লিয়াস না থাকায় নমনীয় হওয়ার কারণে লোহিত রক্ত কনিকাদের এই এ্যাক্রোব্যাটিক আচরন করতে দারুন সুবিধা হয়।

বইয়ের একটি কভার এবং শিরদাড়া (Backbone) প্রয়োজন পৃষ্ঠাগুলোকে সুশৃংখল করার জন্য। মানব জিনোমে ক্রমোসমই শিরদাড়ার কাজ করে থাকে। ক্রমোসম সব অংশকে সংগ্রহ করে এবং সবগুলিকে একত্রে ধরে রাখে। ক্রমোসম যে সমস্ত অনু এবং রাসায়নিক পদার্থ জিনোম গঠন করে সেগুলোকে জড়ো করে এবং সুশৃংখলভাবে সাজিয়ে রাখে।

তবে মানব জিনোম শুধুমাত্র একটি গ্রন্থ না বলে একে এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মানব জিনোমে সর্বমোট ছয়চল্লিশটি ক্রমোসম আছে যাকে আমরা ছয়চল্লিশটি এনসাইক্লোপিডিয়া ভলিউম হিসাবে ভাবতে পারি। এই ভলিউমগুলির অদ্ভুত এক ধরনের বৈশিষ্ট আছে; প্রতিটি ভলিউমই জোড়ায় জোড়ায় বিদ্যমান। এর ফলে যদি কোন একটি ভলিউমে ছাপার ভুলও থাকে তবে তবে জোড়ার অন্যটিতে শুদ্ধ থাকার মোটামুটি ভাল একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে মানব জিনোম মুলত তেইশ জোড়া ক্রমোসম, যা মিলে গড়ে উঠেছে সর্বমোট ছয়চল্লিশটি ক্রমোসম।

এনসাইক্লোপিডিয়ার কোন একটি ভলিউম যেমন অসংখ্য বিষয় নিয়ে আলোকপাত করে, তেমনি বিভিন্ন ক্রমোসম এর জোড়াগুলিও বিভিন্ন ধরনের তথ্য জমা করে রাখে। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এনসাইক্লপিডিয়া যেমন বর্ণের আনুক্রমিক অনুসারে সাজানো থাকে, তার

বদলে ক্রমোসমগুলো সম্পর্কযুক্ত কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে সাজানো থাকে। কিছু ক্রমোসম জড়ো হয় এমন কিছু ইনফরমেশন বা তথ্য নিয়ে যা কোষের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রন করে। আবার কিছু জড়ো হয় সেই সমস্ত তথ্য নিয়ে যা চোখের রং বা চুলের রং ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রন করে।

এনসাইক্লোপিডিয়ার লেখাগুলো লেখা থাকে কাগজের উপর আর জিনোমিক এনসাইক্লোপিডিয়ার ক্ষেত্রে ডিএনএ অনুকে কাগজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই 'কাগজের' উপরই লেখা থাকে 'অনুচ্ছেদ' এবং 'শব্দ' যা জীবনকে নির্দেশনা দেয় কিভাবে গঠিত হতে হবে এবং কিভাবে টিকে থাকতে হবে। এই 'অনুচ্ছেদ' গুলোই হচ্ছে জিন।

জিন-ই কোষকে বলে দেয় কি করতে হবে। অনুচ্ছেদ যেমন অনেকগুলো শব্দের একটি নিবিড় বাঁধন, জিনও তেমনি অনেকগুলো কোডের সমাহার যা একটি কোষকে করে তোলে অর্থপূর্ণ এবং দিয়ে থাকে নির্দেশনা। একটা বইয়ের যেমন সব অনুচ্ছেদই সমান নয়, কোনটি বেশ দীর্ঘ, আবার কোনটি খুবই সংক্ষিপ্ত, তেমনি জিনোমেও কিছু জিন তৈরি হয়েছে দীর্ঘ সিকোয়েন্স দিয়ে আবার কোনটি তৈরি হয়েছে সংক্ষিপ্ত সিকোয়েন্স দিয়ে।

শব্দ যেমন গঠিত হয় অক্ষর দিয়ে, তেমনি জিনও তৈরি হয়েছে নিউক্লিওটাইডস দিয়ে। শব্দের অক্ষরের মতোই নিউক্লিওটাইডসগুলো যেভাবে সাজানো থাকে তার উপর নির্ভর করে এর অর্থ। উদাহরনস্বরূপ, stand শব্দটির একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। কিন্তু এর থেকে একটিমাত্র অক্ষর বাদ দিলেই পুরো শব্দটির মানে বদলে যায়। stand থেকে t বাদ দিলে হয়ে যায় sand. এই দুটি শব্দের বানান প্রায় কাছাকাছি কিন্তু অর্থ পুরোপুরি আলাদা। নিউক্লিওটাইডসের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিস প্রযোজ্য। নিউক্লিওটাইডসের বিন্যাসের মধ্যে কোন একটি 'অক্ষর' এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি জিনের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে দেয় এবং এর ফলে জিনের কার্যক্রম পুরোপুরি ভিন্ন হয়ে পড়ে।

মায়ামি, ফ্লোরিডা
farid300@gmail.com